দৈনিক বাংলা
তথ্য ও ... ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
তারিখ 10 JUL 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3
160
074

সন্তানের ভবিষ্যৎ ও দিশেহারা অভিভাবক

এইচএসসি পরীক্ষা শেষ পর্যায়ে। আর কদিনের মধ্যে পুরোপুরি শেষ হয়ে যাবে। তারপর উদ্বেল প্রতীক্ষা থাকবে ফলাফলের।

পরীক্ষা হয়ে গেলে পরীক্ষার্থী মাত্রই স্বস্তি লাভ করে, এ স্বাভাবিক কিন্তু পরীক্ষার সমাপ্তির সঙ্গে পরীক্ষার্থীর বাবা-মায়ের পরিত্রাণ লাভের ব্যাপারটি অস্বাভাবিক। কিন্তু কালের কল্যাণে এখন তাই হচ্ছে। একালে এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষাগুলো অভিভাবকের ঘাড়েও ভর করে একরাশ আতংক নিয়ে এবং পরীক্ষাগুলোর সুসমাপনে তাঁরাও বাঁচেন হাঁফ ছেড়ে।

এর কারণ সন্তানের পড়ালেখার জন্য তাঁরা যে শ্রম ও উৎকণ্ঠা ব্যয় করতে বাধ্য হন, তা ভাষায় অবর্ণনীয়। এসএসসি-তে দশটি এবং এইচএসসি-তে ছয়টি বিষয়ে (বারোটি পেপারে) কোচিং-এর জন্য কোচিং সেন্টারে বা সংশ্লিষ্ট টীচারের কাছে নিয়ম করে সন্তানকে নিয়ে যাওয়াটা প্রধান কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় বলে অন্যান্য প্রাত্যাহিক কর্ম সম্পাদন করতে গিয়ে সময়ের সঙ্গে পাল্লা লড়তে হয়। এমনকি প্রাধান্যের নিরিখে দৈনন্দিন জীবনের অন্যান্য কাজকে খাটো করে না দেখলেই নয়।

খ্যাতিমান বা যশস্বী শিক্ষকেরা এক জায়গায় জড়ো হয়ে বাস করেন না এবং অভিভাবকদেরও নিবাস বিশেষ একটি জায়গায় হতে পারে না। পুরো শহর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে সময়ের তাল ঠিক রাখতে গিয়ে দূরত্বের সমুদ্রে খাবি খাওয়া যে কী করুণ ব্যাপার, তা জানেন ভুক্তভোগী মাত্রই। ভুক্তভোগী ছাড়া এ দুঃসহ অবস্থা উপলব্ধির ক্ষমতা-ও কারও নেই।

নির্দিষ্ট সময়ে ক্লাশ করে টীচারের বাড়ি বা কোচিং সেন্টারে নির্ধারিত সময়ে পেঁৗছানোর জন্য যে শ্রম ব্যয় করতে হয় ছাত্রকে, একইভাবে তা স্পর্শ করে অভিভাবককে। তাঁকেও সঙ্গী হতে হয় ছেলে বা মেয়ের।

বাবা-মা উভয়েই যদি কর্মজীবী হন, তখন পরিস্থিতি হয় অধিকতর সংকটাপন্ন। কর্মের তাগিদ ও সন্তানের শিক্ষা এই দুয়ের টানাটানিতে জীবনযাপনের আর সব প্রয়োজনীয়তাবোধই হয়ে পড়ে নিষ্ক্রিয়। শুধু কর্মস্থল এবং সন্তানের কোচিং এই দুইয়ের সমন্বয় ঘটাতে গিয়ে জীবনের সহজ সাবলীল গতিই হয়ে পড়ে রুদ্ধ। এর ওপর যদি পড়ুয়া- সন্তান একাধিক হয় এবং ভিন্ন শ্রেণীর ও ভিন্ন গ্রুপের—তবে পরিস্থিতি হয়ে পড়ে ভয়াবহ।

একজন জননী জানিয়েছেন তিনি কাকডাকা ভোরে উঠে যে একবার পোশাক পরে তড়িঘড়ি বের হন, ফের ঘরে ফিরে বেশবাস বদলে সুস্থ হতে পারেন টেলিভিশনের ইংরেজী খবরের সময়। সুস্থ হলেও সুস্থির হতে পারেন না—কেননা তাঁকে ব্যস্ত হতে হয় পরেরদিনের প্রস্তুতিতে—অর্থাৎ সারাদিনমানের সঙ্গে বহন করা খাবার ও বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা, গৃহ সদস্যদের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানো এবং যে পোশাক-আশাক পরে বের হবেন পড়ুয়া সন্তানসহ, তা গোছগাছ করা। তাঁর এমন ত্রিশংকুর অবস্থার কারণ তাঁর কন্যার এইচএসসি পরীক্ষা।

এক বিধ্বস্ত পিতা বলেছেন, সাতসকালে উঠে গরম চা খেয়ে যে বের হন এরপর একটু বসে খেতে পারেন গভীর রাতে। দিনভর বাজারঘাট, অফিস, সন্তানের স্কুল-কলেজ ও কোচিং সেন্টার সেরে তিনি যখন ঘরে ফেরেন, তখন তাঁকে আয়েশ করে বসলে চলে না। নিবিষ্ট হতে হয় অর্থোপার্জনের অতিরিক্ত কাজে।

সাধ ও সাধ্যের অবিরাম টাগ অব ওয়ারে যুঝতে হয় সকলকে; এর মধ্যে এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষা আসে যেন আতংক হয়ে। কে সন্তানকে ক্লাসে পেঁৗছাবে। কে কোচিং ক্লাসে—ঘরবাড়ি পাহারা দেবে কে, কে পরিচর্যা করবে শিশু-বৃদ্ধের-রোগীর। কে রাঁধবে, বাড়বে, বাজার করবে—কে বিদ্যুৎ, টেলিফোন, গ্যাস, পানির বিল মেটাবে—বাড়ির একটি মাত্র সন্তানের শিক্ষাদানের চিত্র-ই এই। একাধিক হলে তো কথাই নেই।

প্রশ্ন ওঠে ছাত্রের দিকেও। স্কুল বা কলেজে ক্লাস শেষ করে দৈনিক দূর দূর অঞ্চলের কোচিং-সেন্টারে গিয়ে অথবা গৃহ-শিক্ষকের কাছে পাঠ শেষে দিনের কতোটা সময় থাকে তার হাতে ঐ পাঠ অভ্যস্থ করার জন্য? কতোটা সময় সে লাভ করে তার নিজের মত করে খাওয়া, ঘুমানো, বিশ্রাম, আনন্দ আহরণের জন্য? লাভ করে না।

আজকের স্কুল কলেজের ছাত্র মানেই নিত্য পরীক্ষার্থী। এ পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য তার অনভিজ্ঞ ও ছোট জীবনের অমানবিক পরিশ্রম প্রয়োজন। তার লক্ষ্য হতে হবে 'মেধা তালিকা, স্টার লেটার' হলে মন্দ না—কিন্তু শুধু 'প্রথম বিভাগ' কিছু না। কিছু না। একালের ছাত্রের উদ্দেশ্য একটিই হতে হবে পরীক্ষার ফলাফলে চমক সৃষ্টি, তার মেধা, মনন, যোগ্যতা যাই হোক না। তাই বেচারা ছাত্রকে এখন আর বিস্ময়ে আনন্দে চাপল্যে শিহরণে আকাশ বাতাস নদীনালা, পর্বত, অরণ্য কল্পনা করলে চলে না।

কালের অগ্রগতিতে ভাল ছেলের সংজ্ঞা থেকে সুবোধের [illegible] ব্যক্তিত্বহীন গোপালেরা পরিত্যক্ত হয়েছে—চারিত্রিক নিষ্প্রভতাই তাদের যাহা পায় তাহাই খায় বৈশিষ্ট্যের উৎস বলে প্রতীয়মান হয়েছে। কিন্তু আধুনিক পাঠ্য বিষয় ও পাঠ পদ্ধতির কল্যাণে যে পাঠভারাক্রান্ত চরিত্রের সাবলীলতা-বিবর্জিত নব্য-গোপাল-শ্রেণীর সৃষ্টি হচ্ছে, এ সত্যটি সমাজের দৃষ্টির অন্তরালেই থেকে যাচ্ছে। প্লে গ্রুপ, নার্সারি, কে জি থেকে বইয়ের যে বিপুল ব্যাগ শিশুর কাঁধে তুলে দেয়া হয়, তাই এসএসসি, এইচএসসি পর্যায়ে সাধ্যাতীত রেজাল্টের আশায় তাকে শাটলককের মত ক্লাসে, কোচিং সেন্টারে, শিক্ষকের গৃহে ঘুরিয়ে মারে। তার নিজের চাইতেও বেশি অভিভাবকের প্রত্যাশা তাকে এই কঠিন পাঠ-চক্র-জালে আবদ্ধ করে ফেলে—যে করেই হোক তাকে অতি ভাল ফলাফল পেতেই হবে। নইলে সবই বিফলে যাবে।

আসলে যায়ও। আজকের দিনে সাধারণ প্রথম বিভাগ পর্যন্ত অপাংক্তেয়, উচ্চতর শিক্ষার জন্য প্রয়োজন অত্যুজ্জল ফলাফল। এ জন্যই অতি সাধারণ ফলাফলের জন্যই এমন রক্তাক্ত প্রয়াস ও সাধ্যের সঙ্গে সংগ্রাম।

অথচ ফলাফল শূন্য। সামর্থ্যের সঙ্গে লড়ে জীবনপণ প্রচেষ্টা চালিয়ে পরীক্ষা নামের প্রতিযোগিতায় ছাত্রকে ঠেলে দিয়ে তার কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই হচ্ছে বেশী।

মনে হয় সেদিন দূরে নয়, যেদিন কিশোর ও অতি তরুণ শিক্ষার্থীরাই পরীক্ষার প্রতি বিরূপ হয়ে পড়বে, বীতশ্রদ্ধ হবে পাঠচর্চার প্রতি। এই বিরাগ যে কী পরিণাম ডেকে আনবে, তা কল্পনা করতেও কষ্ট হয়। তাই সতর্কতার দরকার। কেননা এখনও সময় আছে।

হোসনে আরা শাহেদ